জলবায়ু অঞ্চলসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তন
(Climatic Regions and Climate Change)

ইউনিট ৯

ভূমিকা

জলবায়ু বলতে সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর গড় অবস্থাকে বুঝায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু পরিলক্ষিত হওয়ায় জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ একে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে জলবায়ু বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির কোপেন এর শ্রেণিবিভাগ অন্যতম। এই ইউনিটে জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ, নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল, ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল, মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল, বাংলাদেশের জলবায়ু, গ্রিনহাউজ প্রভাব ও বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ব্যবহারিক হিসেবে সমতাপ রেখা, সমচাপ রেখা ও সমবর্ষণ রেখা অংকন এবং সমতাপ, সমচাপ ও সমবর্ষণ রেখা মানচিত্রে বিশ্লেষণসহ বৃষ্টিপাত উপাত্তের সাহায্যে রেখাচিত্র অংকন ও বাংলাদেশের ঋতু বা মাসভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

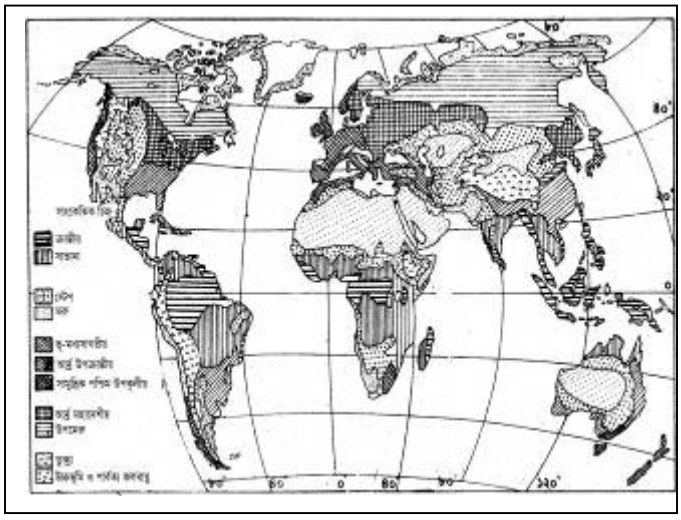

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৯.১ : জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ৯.২ : নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল
পাঠ ৯.৩ : ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল
পাঠ ৯.৪ : মৌসুমী জলবায়ু
পাঠ ৯.৫ : বাংলাদেশের জলবায়ু
পাঠ ৯.৬ : গ্রিন হাউজ প্রভাবও বিশ্ব উষ্ণায়ন
পাঠ ৯.৭ : জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ব্যবহারিকঃ

পাঠ ৯.৮: সমতাপ রেখা, সমচাপ রেখা, সমবর্ষণ রেখা অংকন এবং মানচিত্রে বিশ্লেষণ
পাঠ ৯.৯: বৃষ্টিপাত উপাত্তের সাহায্যে রেখাচিত্র অংকন ও বিশ্লেষণ

পাঠ-৯.১ জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Climate)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলবায়ুর সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জলবায়ু

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আবহাওয়া ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত ৩০-৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে বলা হয় জলবায়ু। উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুচাপ, তাপমাত্রা ইত্যাদি আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক।

জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ : পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহের বিভিন্নতার জন্য ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে মেরু পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরনের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের জন্য যে অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া ও ধরণ তা বুঝার জন্য পৃথিবীর অঞ্চলের জলবায়ুকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। জলবায়ুর বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভ্লাদিমির কোপেনের শ্রেণিবিভাগ (চিত্র-৯.১.১)।

ভ্লাদিমির কোপেনের জলবায়ু শ্রেণিবিভাগ : প্রতি মাসের এবং বছরের গড় আবহাওয়া এবং শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও শুষ্কতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে ভ্লাদিমির কোপেন ১৯০১ সালে প্রথম পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে সংশোধনের পর চূড়ান্তভাবে এই শ্রেণিবিভাগ প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক উদ্ভিদকে সামগ্রিক জলবায়ুর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধরে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়। গড় মাসিক তাপমাত্রা ও প্রধান উদ্ভিজ্জ অঞ্চলকে মূল্যায়ন করে কোপেন জলবায়ু অঞ্চলকে ৫ ভাগে ভাগ করে ইংরেজি বর্ণমালার A থেকে E পর্যন্ত নাম দেন। নিম্নে A-E অক্ষরে বিভাজিত এই জলবায়ুর ভাগগুলোর বর্ণনা তুলে ধরা হলো-

A. **উষ্ণমন্ডলীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ (Tropical Rainy Climates) :** এই জলবায়ু অঞ্চলের শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১৮° সে. এর বেশি নয়। এখানে এমন সব গাছ জন্মে যাদের জন্য অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এই জলবায়ু তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

১. উষ্ণমন্ডলীয় আর্দ্র জলবায়ু, ২. উষ্ণমন্ডলীয় মৌসুমি জলবায়ু এবং ৩. উষ্ণমন্ডলীয় আর্দ্র ও শুষ্ক জলবায়ু।

B. শুষ্ক জলবায়ুসমূহ (Dry Climates) : এ জলবায়ুতে বৃষ্টিপাতের থেকেও বাষ্পীভবন বেশি হওয়ার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানি নিচের স্তরে নেমে যায়। এ জন্য এই এলাকায় সর্বদা প্রবাহমান নদী থাকে না। বাষ্পীভবন ও বৃষ্টিপাতের উপর উদ্ভিজ্জের বৃদ্ধি নির্ভরশীল। আবার বাষ্পীভবনের পরিমাণ নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। এজন্য শীতকাল ও গ্রীষ্মকালে যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান হয় তখন গ্রীষ্মকালে বাষ্পীভবন বেড়ে যায়। বায়ুর তাপমাত্রা, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও ঋতুগত বন্টনের উপর ভিত্তি করে কোপেন B গোত্রের জলবায়ুকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেন। যথা-

১. মরু জলবায়ু এবং ২. অর্ধশুষ্ক বা স্টেপ জলবায়ু।

C. মৃদু শীতসম্পন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ (Mid Latitude Cool Rainy Climates) : এ জলবায়ু অঞ্চলে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ৩°সে. ও ১৮°সে. এর মধ্যে থাকে। এ জলবায়ুর গোত্রকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. শীতকাল শুষ্ক, ২. গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং ৩. স্পষ্ট কোনো শুষ্ক ঋতু নেই।

D. চরমভাবাপন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ (Mid Latitude Extreme Rainy Climates) : এ জলবায়ু গোত্রে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ৩° সে. এর কম এবং উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১০° সে. এর বেশি থাকে এবং ভূমি বরফাবৃত থাকে। এ গোত্রে দুটি প্রধান শ্রেণির জলবায়ু হলো-

১. শুষ্ক শীত ঋতুসহ অতি শীতল জলবায়ু এবং ২. আর্দ্র ও অতি শীতল জলবায়ু।

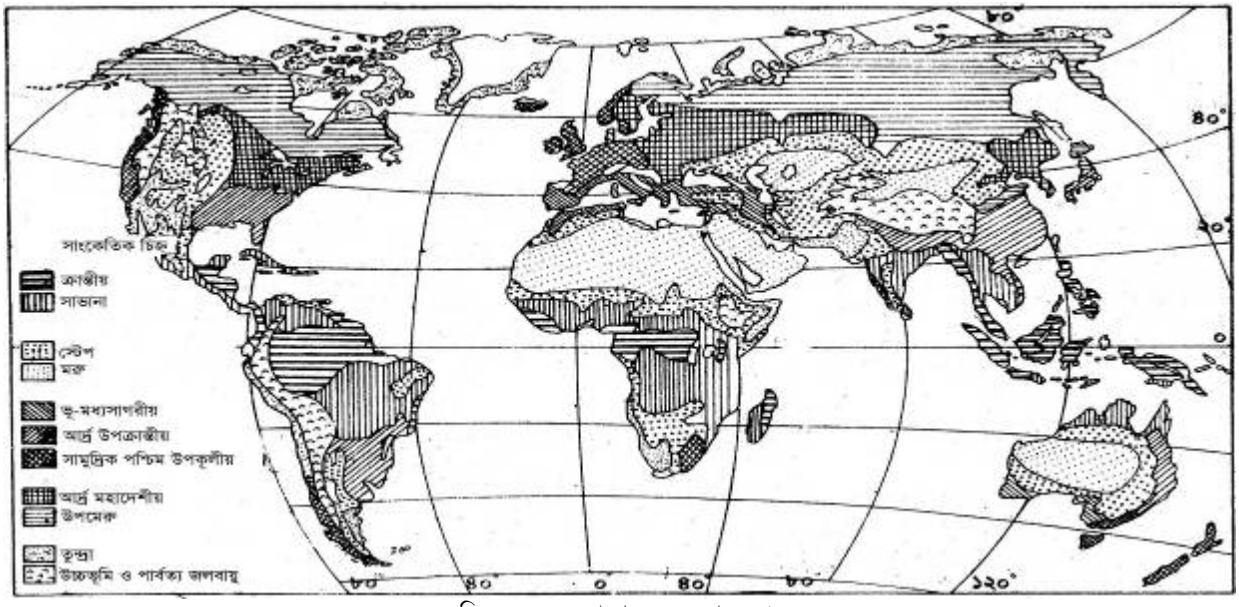

চিত্র-৯.১.১: কোপেনের জলবায়ু অঞ্চল

E. মেরু জলবায়ুসমূহ (Polar Climates) : এ জলবায়ুতে বছরের বেশিরভাগ সময় তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে থাকে। ফলে উদ্ভিজ্জের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য গ্রীষ্মকালের স্থায়িত্ব ও উত্তাপের প্রাচুর্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১০° সে. এর কম থাকে। এই জলবায়ু মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

১. তুন্দ্রা অঞ্চল এবং ২. চিরস্থায়ী বরফের আচ্ছাদনজনিত জলবায়ু।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোপেনের জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

গড় মাসিক এবং বার্ষিক শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও শুষ্কতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে ভ্লাদিমির কোপেন পৃথিবীর জলবায়ুকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলো হলো-শীতল ঋতুবিহীন উষ্ণমন্ডলীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ, শুষ্ক জলবায়ুসমূহ, মৃদু শীতসম্পন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ, চরমভাবাপন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু এবং মেরু জলবায়ু। এই শ্রেণিবিভাগে গড় মাসিক তাপমাত্রা ও প্রধান উদ্ভিজ্জ অঞ্চলকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভ্লাদিমির কোপেনের জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ কত সালে প্রকাশ হয়?

(ক) ১৯০৭ (খ) ১৯০১ (গ) ১৯৩০ (ঘ) ১৯৩৬

২। কোনটি চরমভাবাপন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য?

(ক) বরফাকৃত ভূমি (খ) কম বৃষ্টিপাত

(গ) শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ৫° সে. (ঘ) শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১০° সে.

৩। মেরু জলবায়ু অঞ্চলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

পাঠ-৯.২ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল (Equatorial Climatic Region)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান বলতে পারবেন এবং
- নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে পারবেন।

নিরক্ষীয় জলবায়ু

পৃথিবীর জলবায়ুর পাথর্ক্যের জন্য সূর্যের অবস্থান একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কারণ তাপমাত্রা প্রাপ্তির ধরনের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রকৃতির পার্থক্য তৈরি হয়। নিরক্ষরেখায় অবস্থানকারী দেশসমূহ এবং এই নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থানরত দেশসমূহে নিরক্ষীয় জলবায়ু বিরাজমান বলে একে বলা হয় নিরক্ষীয় জলবায়ু।

অবস্থান ও দেশসমূহ : নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ৫° অক্ষাংশের মধ্যে নিরক্ষীয় অঞ্চল অবস্থিত। সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের ফলে এ অঞ্চলে দুইবার মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানে নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ১০° অক্ষাংশের সীমা পর্যন্ত নিরক্ষরেখা বিস্তৃত। বিষুবরেখার পার্শ্ববর্তী ৯৬৫ কি. মি. এলাকাজুড়ে এই জলবায়ুর প্রভাব বিস্তৃত। আফ্রিকার কঙ্গো নদী অববাহিকা ও গিনি উপকূলীয় এলাকা, মধ্য আমেরিকার পূর্ব উপকূলের পানামা, হন্ডুরাস, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এই জলবায়ু অঞ্চলের অর্ন্তগত। এছাড়াও নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থিত দেশগুলো যেমন- মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ফিলিপাইন, আমাজান নদীর অববাহিকা, পেরু, ইকুয়েডর ও কলম্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চল জুড়েও এই জলবায়ু প্রভাব বিস্তার করে (চিত্র-৯.২.১)।

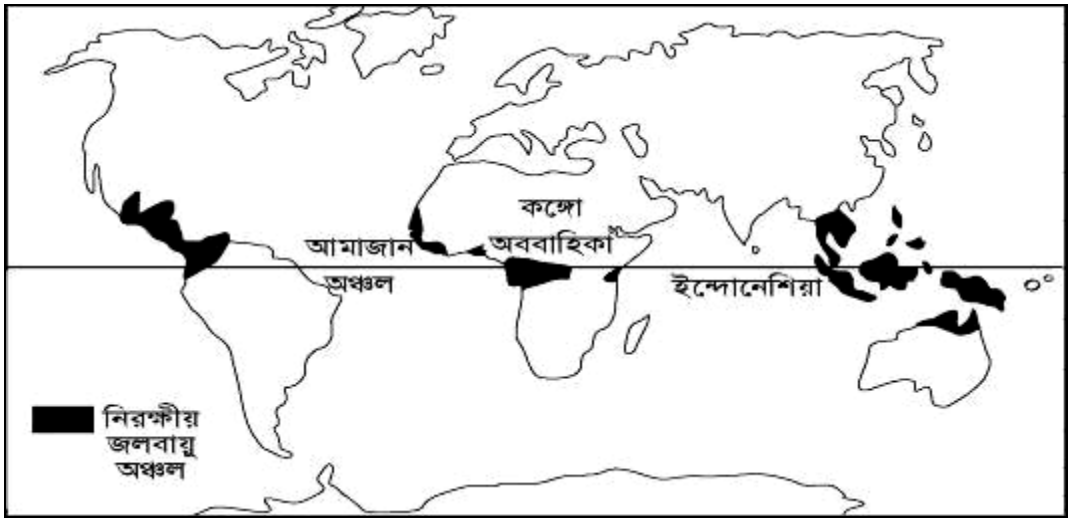

চিত্র-৯.২.১: নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য : নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী দেশগুলোতে সূর্য প্রায় সারাবছরই লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এখানে গ্রীষ্মঋতুর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য দিন-রাতের মধ্যে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তনশীল থাকে। শীতের প্রকোপ একদম নেই বললেই চলে। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

১. সারাবছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়ার জন্য এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি থাকে। দিনের ব্যাপ্তি সারা বছর একই থাকে এবং বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২১°-২৭° সে.। স্থলভাগের বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য ৫° সেলসিয়াসের কম। অত্যধিক সূর্য তাপ ও আর্দ্রতা এবং সামান্য মেঘাচ্ছন্নতার জন্য তাপমাত্রার পার্থক্য কম।

২. অধিক সূর্য তাপ ও জলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় বাষ্পীভবনের মাত্রাও বেশি। এই সকল এলাকায় পরিচলন বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭০০-২৫০০ মিলিমিটার।

৩. অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য চিরহরিৎ বনাঞ্চল দেখা যায়। এই বনাঞ্চলে সেগুন, মেহগনি, রাবার ইত্যাদি গাছ জন্মে। গভীর এই বনাঞ্চলে সহজে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না বলে গাছগুলো সূর্যালোক পাওয়ার জন্য উঁচু হয়।

৪. অধিক উত্তাপ এ অঞ্চলে স্থায়ী নিম্নচাপ তৈরি করে এবং উপক্রান্তীয় উষ্ণ চাপ বলয়ের অয়ন বায়ু এ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। উত্তপ্ত বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় এবং শান্ত বলয় বিরাজমান থাকে। ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে পরবর্তীতে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে।

৫. এ অঞ্চলের মৃত্তিকা কৃষিকাজের জন্য খুব উপকারী হলেও এখানে মাটি ক্ষয় হয়। অতিরিক্ত তাপ ও বৃষ্টিপাতই এই মাটি ক্ষয়ের কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ৫° অক্ষাংশের মধ্যে নিরক্ষীয় অঞ্চল অবস্থিত। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের দেশসমূহ সারা বছর সূর্যের তাপ পায় বলে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেই সাথে উর্বর মৃত্তিকা এবং জলবায়ুর প্রভাবে চিরহরিৎ বনাঞ্চল দেখা যায়। এখানে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তনশীল থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?

(ক) ১০০০-২১০০ মি.মি. (খ) ১২০০-২৫০০ মি.মি.
(গ) ১৭০০-২৫০০ মি.মি. (ঘ) ১৩০০-২৩০০ মি.মি.

২। নিরক্ষরেখার অন্তর্গত দেশগুলোতে কোনটি মাটি ক্ষয়ের কারণ?

(ক) মেরুবায়ু (খ) ঊর্ধ্বমুখী বায়ু প্রবাহ
(গ) অধিক তাপ (ঘ) অধিক বনাঞ্চল

৩। নিরক্ষীয় জলবায়ুর অন্তর্গত দেশ নয় কোনটি?

(ক) সৌদি আরব (খ) ইন্দোনেশিয়া
(গ) ফিলিপাইন (ঘ) ব্রুনাই

পাঠ-৯.৩ ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল (Mediterranean Climatic Region)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের নাম বলতে পারবেন এবং
- ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণে জলবায়ুর ধরনেরও পার্থক্য দেখা যায়। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের ৩০°-৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে যে সকল মহাদেশসমূহের অবস্থান তাদের পশ্চিমাংশ জুড়েই ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল বিস্তৃত। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া, তিউনিশিয়া, মিশরের উত্তরাংশ, মরক্কোর উত্তরাংশ, ভূ-মধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এছাড়াও তুরস্ক, স্পেন, গ্রীস, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালি, ইসরাইল, সিরিয়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম যুগোশ্লাভিয়া এই জলবায়ুর অর্ন্তভুক্ত। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে আরও যে দেশসমূহ রয়েছে সেগুলো হলো- লেবানন, পর্তুগাল, আলবেনিয়া এবং দ্বীপসমূহ হলো কর্ষিকা, মাল্টা, সাইপ্রাস ইত্যাদি। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির মধ্যভাগ এবং উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া এই জলবায়ুর অর্ন্তগত।

বৈশিষ্ট্য : ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উষ্ণ, শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল বৃষ্টিবহুল।

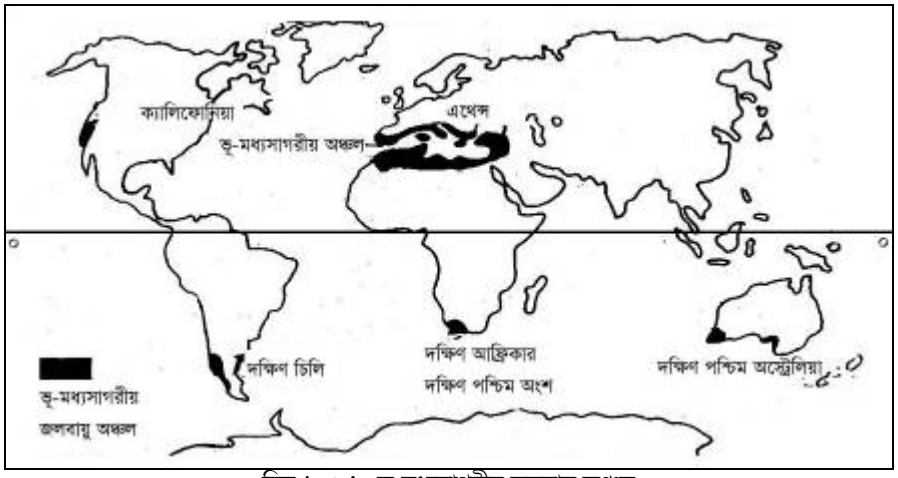

চিত্র-৯.৩.১: ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল

এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে গড় উষ্ণতা থাকে ২০°- ২৮° সে. এবং শীতকালে উষ্ণতা ১০° সে. এর কম থাকে। এই জলবায়ু অঞ্চলে যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য তা হলো- এখানে সমুদ্র বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৮ সে.মি থেকে ৭৫ সে.মি। সাধারণত অন্যান্য এলাকার তুলনায় সমুদ্র উপকূলে বৃষ্টিপাতের হার বেশি। বৃষ্টিপাত অধিক বলে এখানে শীতকালীন বৃক্ষ যেমন- জলপাই, কর্ক, তুঁত, নিম, পাইন গাছের উৎপত্তি লক্ষ্যণীয়। কম বৃষ্টি হয় এমন স্থানে ঝোপঝাড় জন্মে। প্রকৃতপক্ষে ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত দেশগুলোর নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

উত্তর গোলার্ধের ৩০°-৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দেশসমূহ ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও বৃষ্টিবহুল শীতকাল। সুস্বাস্থ্যের জন্য এই জলবায়ু অঞ্চলের আবহাওয়া বেশ সহায়ক। এই জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় বলে উদ্ভিজ্জের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য-

i. পাইন, নিম, তুঁত গাছ জন্মে
ii. আম-কাঁঠাল গাছ জন্মে
iii. শীতকালীন বৃষ্টিপাত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে কোথায় বেশি বৃষ্টিপাত থাকে?

(ক) বনভূমিতে (খ) সমুদ্র উপকূলে (গ) খোলা মাঠে (ঘ) পাহাড়ের কাছে

৩। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক?

(ক) গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২০°-৪০° সে. (খ) বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত ৩৮°-৭৫° সে. মি.
(গ) গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২০°-২৮° সে. (ঘ) বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত ৩০°-৪০° সে. মি.

পাঠ-৯.৪ মৌসুমি জলবায়ু (Monsoon Climate)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৌসুমি জলবায়ুর অর্ন্তভুক্ত দেশগুলোর নাম বলতে পারবেন এবং
- মৌসুমি জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মৌসুমি জলবায়ু

মৌসুমি শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ "মওসুম" থেকে যার অর্থ ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এ বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয় বলে একে মৌসুমি জলবায়ু বলা হয়। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির নিকটবর্তী অঞ্চল জুড়ে যে জলবায়ু বিস্তৃত তা মৌসুমি জলবায়ু। ক্যারিবিয়ান সাগর, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপসমূহের দেশগুলো, পূর্ব আফ্রিকা, পূর্ব ব্রাজিল, উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ চীন ও জাপান, থাইল্যান্ড, কম্পুচিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিয়ানমার অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই জলবায়ু অঞ্চলের অর্ন্তগত। এছাড়াও মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহ, লাওস, মালাগাছি দ্বীপও এই জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত।

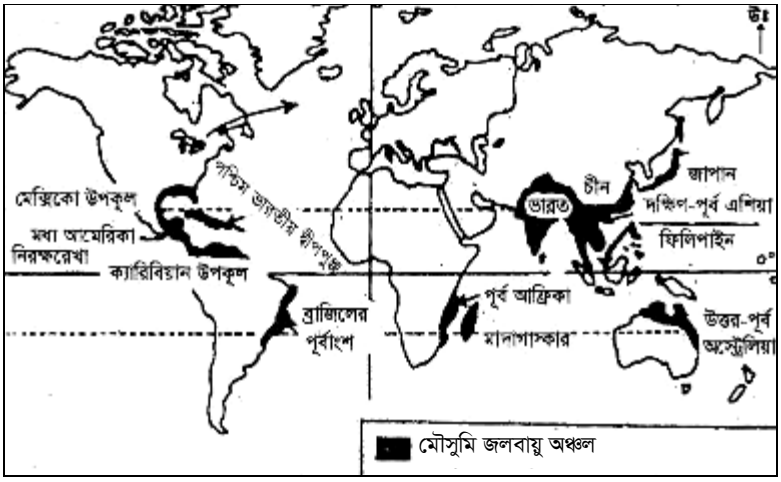

চিত্র-৯.৪.১: মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল

মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য : মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. মৌসুমি জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে অধিক গরম ও শীতকালে শীত পড়ে। জুলাই মাস সবচেয়ে বেশি গরম ও জানুয়ারি মাসে বেশি শীত পড়ে। গ্রীষ্মকাল আর্দ্র ও শীতকাল শুষ্ক এই জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে যখন বৃষ্টিপাত বেশি হয় তখন তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা গড়ে ২৭° সে. এর বেশি থাকে এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ১° সে. থেকে ২২° সে. এর মধ্যে থাকে। শীত ও গ্রীষ্মে তাপমাত্রার পার্থক্য ৫° সে. থেকে ১০° সে. হয়।

২. গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধে সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপর দিয়ে লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এই সময় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ভারত প্রভৃতি স্থানে বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধের উচ্চচাপ বলয় থেকে আসা দক্ষিণ পূর্ব অয়ন বায়ু এশিয়া মহাদেশের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবলবেগে ছুটে যায়। এই বায়ুকেই বলা হয় উত্তর গোলার্ধের মৌসুমি বায়ু। ফেরেলের সূত্রানুযায়ী একে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বলা হয়। কারণ নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ডানদিকে বেঁকে দক্ষিণ পূর্ব অয়ন বায়ু দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

৩. আবার শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধের মকরক্রান্তির নিকট অবস্থান করায় সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ শীতল হওয়ার জন্য সেস্থানে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু দক্ষিণে নিম্নচাপে প্রবাহিত হয় বলেই তাকে বলা হয় উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু এবং স্থলভাগে প্রবাহিত হয় বলে এই বায়ু জলীয়বাষ্পহীন।

৪. মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত বেশি হয় কিন্তু শীতকাল শুষ্ক থাকে। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২৫ সে.মি. থেকে ২০০ সে.মি.। তবে অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরাও এই জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায়। কখনো কখনো পর্বতের ঢালে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বায়ু উপরে উঠে যায় ফলে বৃষ্টিপাত হয়।
৫. এই জলবায়ু অঞ্চলে উর্বর ভূমি ও পলিমাটি কৃষিকাজের জন্য উপকারী।

উর্বর মাটি ও বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত সূর্যালোক মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমির বিস্তার ঘটায়। চিরহরিৎ বৃক্ষের বনাঞ্চলে ২০০ সে.মি এর বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং তৃণভূমি অঞ্চলে ৫° সে.মি থেকে ১০০ সে.মি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মৌসুমি জলবায়ু কাকে বলে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

আরবি "মওসুম" শব্দের অর্থ ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনের কারণে এই ধরনের বায়ুপ্রবাহকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ বলা হয়। বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্ম, অধিক তাপ, শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন শীতকাল এই জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মৌসুমি জলবায়ুর বনভূমি হলো-

i. পাতাঝরা ii. তৃণভূমি iii. চিরহরিৎ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। মৌসুমি জলবায়ুতে বায়ুপ্রবাহ কোন সূত্র অনুযায়ী হয়?

(ক) ওয়েবারের তত্ত্ব (খ) কোপেনের থিওরি
(গ) ফেরেলের সূত্র (ঘ) কোনটিই নয়

৩। মৌসুমি জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মর তাপমাত্রার পার্থক্য কতটুকু হয়?

(ক) ৭°-৮° সে. (খ) ৫°-১০° সে.
(গ) ৮°-১২° সে. (ঘ) ১০°-১৫° সে.

পাঠ-৯.৫ বাংলাদেশের জলবায়ু (Climate of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি ও ধরনের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের জলবায়ু

বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি সমভাবাপন্ন। কর্কটক্রান্তি রেখা এ দেশের প্রায় মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজমান। তবে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব থাকায় এদেশের সামগ্রিক জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু বলা হয়। এদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সে.মি। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় সিলেট অঞ্চলে। উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল এদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে ৩টি প্রধান ঋতুতে ভাগ করা যায়। যথা- ক. গ্রীষ্মকাল, খ. বর্ষাকাল এবং গ. শীতকাল (চিত্র ৯.৫.১, চিত্র ৯.৫.২ এবং চিত্র ৯.৫.৩)।

ক. গ্রীষ্মকাল : মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এ সময়কেই গ্রীষ্মকাল ধরা হয়। গ্রীষ্মকালে গড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১° সেলসিয়াস। গড় তাপমাত্রা মধ্য এপ্রিল ও মে মাসে সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় যা প্রায় ২৮° সেলসিয়াস। গ্রীষ্মকালেই কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় দেখা যায়। মার্চ-এপ্রিল মাসের কালবৈশাখী অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ সময় গড় বৃষ্টিপাত ৫১ সে.মি এবং বাংলাদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা ২০ ভাগ গ্রীষ্মকালে হয়। সূর্যের উত্তরায়নের ফলে বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। এছাড়াও বাংলাদেশের দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপে উপরে উঠে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক হতে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহের সাথে সংঘর্ষে বজ্রঝড়ের সৃষ্টি করে।

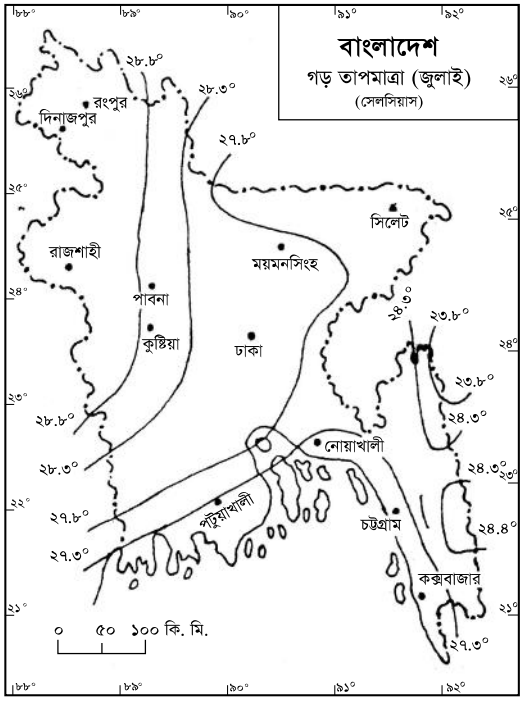

চিত্র-৯.৫.১: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)

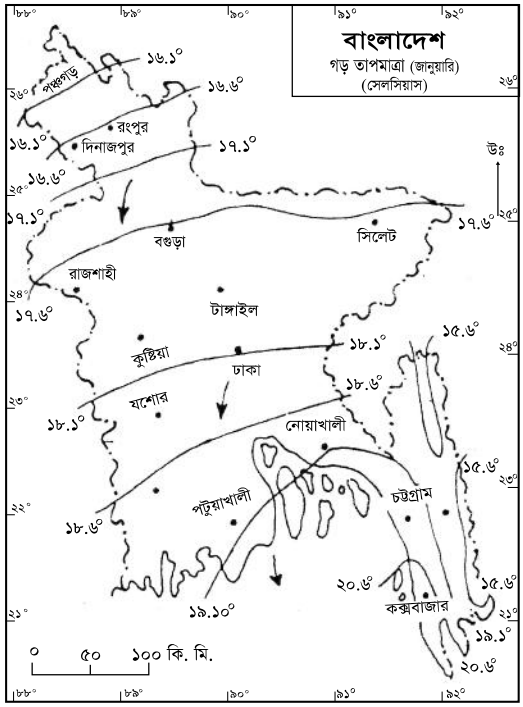

চিত্র-৯.৫.২: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

খ. বর্ষাকাল : বাংলাদেশে মধ্য জুন থেকে নভেম্বর (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) পর্যন্ত বর্ষাকাল। বর্ষাকালেও অধিক সূর্যতাপ থাকার ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে আকাশে মেঘ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে অধিক তাপমাত্রা উপলব্ধি করা যায় না। বর্ষাকালে অধিক জলীয়বাষ্পের কারণে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয়। এই সময় গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসে। বছরে মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ এসময় হয়। বর্ষার শেষ দিকে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।

গ. শীতকাল : বাংলাদেশে নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময় শীতকাল। এই সময় তাপমাত্রা কমতে থাকে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে এবং এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস। শীতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস। শুষ্ক শীতকাল এবং উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায় সামান্য বৃষ্টিপাত এই দেশের শীতকালের বৈশিষ্ট্য। দেশের উত্তরাঞ্চলে তীব্র শীত অনুভূত হয়। এসময় বাতাসের সর্বনিম্ন আর্দ্রতা শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ থাকে।

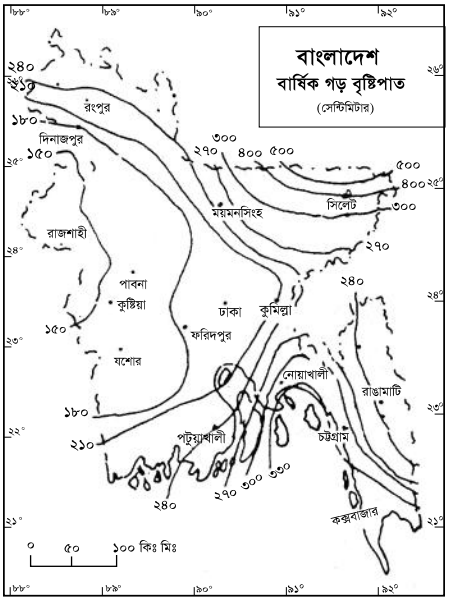

চিত্র: ৯.৫.৩: বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আর্দ্র ও অধিক তাপমাত্রা সম্পন্ন গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক ও শীতল শীতকাল। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদেশের ঋতুকে প্রধানত গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?
(ক) ১০৩ সে.মি (খ) ২০৩ সে.মি (গ) ৩০৩ সে.মি (ঘ) ৪০৩ সে.মি

২। বর্ষাকালে বাংলাদেশে কোন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়?
(ক) পরিচলন (খ) সাংঘর্ষিক (গ) শৈলোৎক্ষেপ (ঘ) সাইক্লোনিক

৩। বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?
(ক) জানুয়ারি (খ) ফেব্রুয়ারি (গ) নভেম্বর (ঘ) ডিসেম্বর

৪। গ্রীষ্মকালীন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত?
(ক) ১১° সে. (খ) ১৬° সে. (গ) ২১° সে. (ঘ) ২৭° সে.

পাঠ-৯.৬ গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বিশ্ব উষ্ণায়ন
(Green House Effect and Global Warming)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রিন হাউজ ও এর প্রতিক্রিয়া বলতে পারবেন এবং
- বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ, প্রভাব এবং প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

পৃথিবী জুড়ে উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। বলা হয়ে থাকে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার জন্য মানবসৃষ্ট কর্মকান্ড দায়ী। শক্তি সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধি, অধিক জনসংখ্যার চাপ, ব্যাপক জ্বীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিবছরই মানবসৃষ্ট নানা ধরনের দূষণ আমাদের চারপাশের পরিবেশকে বিপর্যস্তড় করছে। পৃথিবী পৃষ্ঠে গ্রিন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধির জন্য মানুষের অতি শিল্প নির্ভরশীলতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রবণতাকে দায়ী করা হয়।

গ্রিন হাউজ হলো এমন একটি কাঁচের ঘর যেখানে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গাছপালা জন্মানোর জন্য উপযোগী আবহাওয়া তৈরি করা হয়। সূর্যের আলো যখন এই কাঁচের ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে তখন ভিতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীও গ্রিন হাউজের মত এমন একটি আবাসস্থল যেখানে প্রতিদিনই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পৃথিবী হতে দূরীভূত হচ্ছে না। গ্রিন হাউজের তাপমাত্রা ধরে রাখার প্রক্রিয়াটি বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণেই গ্রিন হাউজ এর সাথে মিল রেখে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করা হয়েছে গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হলো বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এটিকে গ্রিন হাউজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্যাসকে দায়ী করা হয়। এগুলো হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেন, ওজোন, জলীয়বাষ্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ : ১৮০০ সালের প্রথম দিকে শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই কয়লা, তেল, গ্যাসোলিনের মত জ্বীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ফলে বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি, বনায়ন এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়। কল-কারখানা ও যানবাহনের নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া, নগরায়ন, বাড়ি ঘরের অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, অতিরিক্ত খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতার কারণে বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মিও পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসরত জীবজগতের জীবনধারণে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব : বৈশ্বিক উষ্ণায়নের উল্লেখযোগ্য প্রভাবসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. **জলবায়ু পরিবর্তন :** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মুখ্য প্রভাব হলো জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন- অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি। এছাড়া অধিক গরম, খরা, এসিড বৃষ্টি প্রভৃতি দেখা দিচ্ছে।

২. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি :** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের হার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের হার সবচেয়ে বেশি।

৩. **মেরু অঞ্চলের বরফ গলন :** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে।

৪. **সমুদ্রে পৃষ্ঠের উচ্চতা পরিবর্তন :** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মিশর, ভিয়েতনাম, ফিজি, কিরিবাতি, টুভ্যালু প্রভৃতি দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া কৃষি জমি লবণাক্ত হয়ে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

৫. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস : বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীতে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল বিলুপ্ত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন উদ্ভিদ ও প্রাণির বসবাসের অনুকূল পরিবেশে সরাসরি আঘাত হানার মধ্য দিয়ে ধ্বংস সাধন করছে।

৬. **রোগব্যাধি :** উষ্ণায়নের ফলে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যেমন-ম্যালেরিয়া, এজমা, এলার্জি প্রভৃতি রোগের বিস্তার ঘটছে।

এছাড়া পৃথিবীর ভূমিক্ষয়, সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, মাটির উর্বরতা হ্রাস, প্রাকৃতিক জলাশয়ের উৎস বিনষ্ট হওয়া, খাদ্যে অনিরাপত্তা, বাস্তুসংস্থানের চক্র বিনষ্ট হওয়া, ওজোন স্তরের কার্যক্রম নষ্ট হওয়া, সমুদ্রে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ কমে যাওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে পৃথিবীবাসী।

গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধের উপায় : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধানে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো-

১. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কার্বন উৎপাদনের হারকে কমিয়ে আনা;
২. যানবাহন ও কল-কারখানার দূষিত গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ;
৩. যথাযথ মাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার;
৪. বিকল্প জ্বালানি যেমন- কয়লা, খনিজ তেল, পারমানবিক শক্তি এর পরিবর্তে সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি, জৈব গ্যাস ব্যবহার করা;
৫. প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ এবং নতুন বন সৃজন;
৬. পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন;
৭. জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক পদক্ষেপ প্রভৃতি।

সুতরাং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পৃথিবী ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ কী ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন। বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবী জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাপকভাবে ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এর উল্লেখযোগ্য কারণ হলো গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসকারী মানুষ ও জীবজন্তুর জীবন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধে এখনই কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গ্রিন হাউজ প্রভাবের জন্য দায়ী-

i জলীয়বাষ্প ii. হাইড্রোজেন iii. মিথেন
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। কোন সালে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব বৈশ্বিক উষ্ণায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

(ক) ১৪০০ এর পরে (খ) ২০০০ সালে (গ) ১৮০০ এর পরে (ঘ) ১৬০০ এর পূর্বে

৩। কোনটি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলাফল?

(ক) নতুন সড়কপথ সৃষ্টি (খ) মহাশুন্যে অভিযান
(গ) হিমালয়ের বরফ গলন (ঘ) সমুদ্রের পানি নিচে নেমে যাওয়া

পাঠ-৯.৭ জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (Climate Change & Bangladesh Perspective)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মাঝবরাবর কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অধিক জনসংখ্যার চাপ, মানুষের গ্রাম হতে শহরে স্থানান্তর, প্রাকৃতিক ও শক্তি সম্পদের উপর অধিক চাহিদা, অপরিকল্পিত নগরায়ন সবই এদেশের প্রাকৃতিক উপাদানের উপর প্রভাব ফেলছে। মানবসৃষ্ট কর্মকান্ডের নেতিবাচক প্রভাব এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট করছে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মানুষ আজ ঝুঁকিপূর্ণ দিনাতিপাত করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন : কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকায় দীর্ঘ মেয়াদে গড় আবহাওয়ার পরিবর্তনকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলে। আমরা জানি, পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পতিত হয় ভূ-পৃষ্ঠ তা শোষণ করে নেয়। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ : জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে থাকে মূলত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে। আর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো-

১. জীবাশ্ম জ্বালানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার;
২. শিল্প-কারখানার ধোঁয়া ও বিষাক্ত বর্জ্য;
৩. যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া যেমন- কার্বন মনোঅক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড;
৪. ব্যাপকহারে বনাঞ্চল ধ্বংস;
৫. তেজস্ক্রিয় দূষণ;
৬. বনভূমি এলাকায় দাবানল;
৭. ওজোন স্তর ক্ষয় এবং
৮. মানুষের বিলাসবহুল জীবযাপনের জন্য প্রস্তুত বিভিন্ন সামগ্রী (যেমন-এয়ারকন্ডিশনার) প্রভৃতি।

জলবায়ু পরিবর্তনে বৈশ্বিক প্রভাব : আগামী দশকের যে সকল চ্যালেঞ্জ বিশ্ববাসীকে মোকাবেলা করতে হবে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বিরূপ প্রভাব। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তার অভাব, ক্ষুধা ও দারিদ্রতার হার বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের ফলন ও মান কমে যাওয়া, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, সুনামির প্রকোপ বৃদ্ধি, অস্বাভাবিকভাবে ঋতু বৈচিত্র্যের চক্র নষ্ট হওয়া, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়া, ইকোলজির প্রতি হুমকি প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপর প্রভাব : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপরও বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপরও যেসব প্রভাব পড়বে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. উপকূলীয় অঞ্চলের জমিতে লবনাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি,
২. কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস,
৩. অধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি,
৪. দেশের উত্তরাংশসহ বিস্তীর্ণ এলাকা খরায় আক্রান্ত হওয়া,
৫. ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া,
৬. আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া,
৭. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ যেমন- অতিরিক্ত লবনাক্ততায় মৎস্য প্রজাতির বিলুপ্তি দেখা যাচ্ছে।
৮. যে হারে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রায় ১৫% স্থলভাগ হারানোর সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ৩০ মিলিয়ন (৩কোটি) মানুষ ও নানা প্রজাতির জীবজন্তু, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
৯. এদেশের স্বতন্ত্র বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো সুন্দরবন, সেখানে প্রাণি বৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।
১০. বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট প্রভৃতি।

এছাড়াও অতিবৃষ্টি, বন্যা, শহরে জলাবদ্ধতা, বনভূমি উজাড় হয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের এ সকল সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা তথা উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের জীবনরক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো কী তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক পরিবেশে নানামুখী প্রভাব বিস্তার করছে। বাংলাদেশেও জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাবসমূহ জীবনযাত্রাকে হুমকির সম্মুখীন করছে। অতিরিক্ত খরা, বন্যা, বনভূমি ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদ বিলুপ্তি ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব-
i সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ii. অধিক জনসংখ্যা iii. খাদ্য নিরাপত্তা হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। অতিরিক্ত লবণাক্ততার ফলাফল কোনটি?
(ক) শহরে অভিগমন (খ) মাছ চাষ বৃদ্ধি (গ) শহরে বনাঞ্চল বৃদ্ধি (ঘ) কৃষি জমি নষ্ট হওয়া

৩। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কোনটি সম্পর্কযুক্ত?
(ক) বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি (খ) গাছ লাগানো (গ) কৃষিকাজ করা (ঘ) মাছের বংশ বৃদ্ধি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মিরা তার বোনকে বললেন, প্রতিদিন যে হারে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনও ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু অঞ্চলসমূহের বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে প্রাণি ও উদ্ভিদজগতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

(ক) জলবায়ুর পরিবর্তন কী?

(খ) বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ কী?

(গ) উদ্দীপকের আলোকে বৈষ্ণিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক লিখুন।

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে কী ধরনের প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১: ১. খ ২. ক ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২: ১. গ ২. গ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩: ১. গ ২. খ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪: ১. খ ২. গ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫: ১. খ ২. গ ৩. ক ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬: ১. খ ২. গ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭: ১. গ ২. ঘ ৩. ক

পাঠ-৯.৮

সমতাপ রেখা, সমচাপ রেখা, সমবর্ষণ রেখা অংকন এবং মানচিত্রে বিশ্লেষণ (Draw a Line of Isotherm, Isober & Isohyet and Analysis on Map)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমতাপ, সমচাপ ও সমবর্ষণ রেখা অংকন ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সমতাপ রেখা

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থান বা দেশের সমান বায়ুতাপ বিশিষ্ট স্থানসমূহকে মানচিত্রের উপর সাবলীল বক্ররেখা দ্বারা সংযুক্ত করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয়, তাকে সমতাপ রেখা মানচিত্র বলে এবং সমান রেখাসমূহকে বলা হয় সমতাপ রেখা।

সমতাপ রেখা অঙ্কন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ : কোনো এলাকায় তাপমাত্রার ধরনের উপর ভিত্তি করে সমতাপ রেখা অঙ্কন করা হয়। নিম্নে সমতাপ রেখা মানচিত্রে অঙ্কনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো-

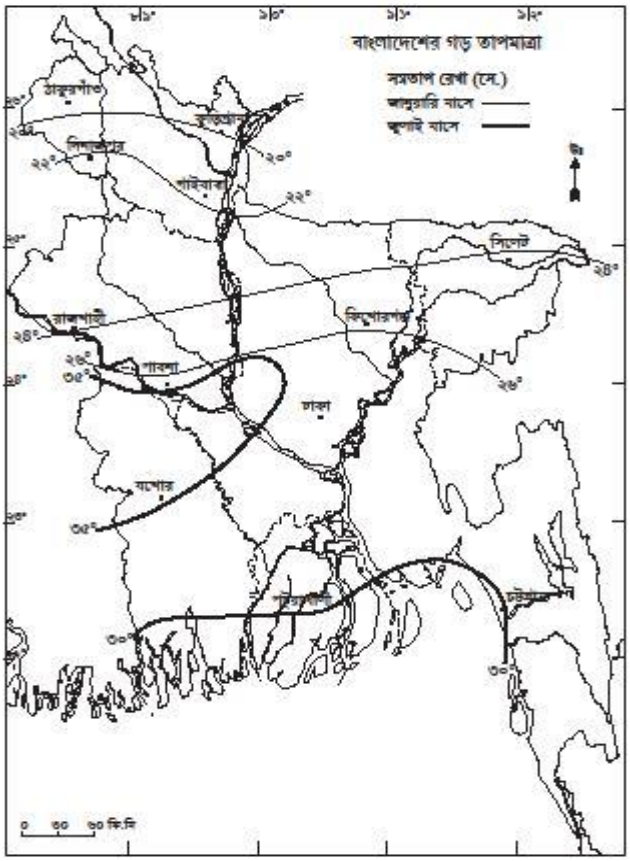

চিত্র-৯.৮.১- সমতাপ রেখার মাধ্যমে বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রার বিন্যাস বিশ্লেষণ

উপরের মানচিত্রে জুলাই ও জানুয়ারি দুই মাসের তাপমাত্রার বিন্যাস দেখানো হয়েছে। যে সকল অঞ্চলসমূহ একই ধরনের তাপমাত্রা বিশিষ্ট তা একটি রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। অঙ্কিত রেখাটি সমান তাপমাত্রা বিশিষ্ট এলাকাসমূহকে মানচিত্রে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে বলেই এই সকল রেখাকে বলা হয় সমতাপ রেখা। সমতাপ রেখা দ্বারা কোনো অঞ্চলের

ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রার পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। যেমন- চিত্রে জানুয়ারি ও জুলাই মাসের তাপমাত্রার পার্থক্যের ধরণ দুটি ভিন্ন আকারের সমতাপ রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। সমতাপ রেখা অঙ্কনে সুবিধা হলো এই রেখা দ্বারা কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর গড় তাপমাত্রাকে জানা যায় এবং ভূগোল শাস্ত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা এই সমতাপ রেখা অঙ্কনের মাধ্যমে একেক অঞ্চলে সূর্যরশ্মি পতন, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা ও শীতের প্রকোপ ইত্যাদি পরিমাপ করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের সারণি থেকে সমতাপ রেখা অঙ্কন করে মানচিত্র তৈরি করুন।

স্থান	তাপমাত্রা
ঢাকা	৩৩.০° সে
টাঙ্গাইল	৩০.৩° সে
ময়মনসিংহ	৩১.৫° সে
পঞ্চগড়	২৮.০° সে
ঠাকুরগাও	২৫.৩° সে
রংপুর	২২.৪° সে

সমচাপ রেখা (Isober Line) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানের বায়ুর চাপ নির্ধারণ করে যখন মানচিত্রে প্রকাশ করা হয় তাকে সমচাপ রেখা মানচিত্র এবং রেখাসমূহকে সমচাপ রেখা বলে। সাধারণত ৪ মিলিবার পরপর সমচাপ রেখা অঙ্কন করা হয়। যে স্থানে বায়ুর চাপ বেশি সেই স্থানে উচ্চচাপ এবং যে স্থানে বায়ুর চাপ কম সে স্থানে নিম্নচাপ অবস্থা প্রকাশ করা হয়। সমচাপ রেখার মাধ্যমে কোনো স্থানের বায়ুর চাপের ও গতির পার্থক্য সম্পর্কে জানা যায়। সাধারণত সমুদ্রগামী জাহাজ, নদীবন্দরে অবস্থিত নৌযান চলাচলে কোনো সতর্কবার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে এই সমচাপ রেখা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। সমচাপ রেখার মাধ্যমেই বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এলাকাগুলো সহজে চিহ্নিত করা যায়।

সমচাপ রেখা অঙ্কন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ : সমচাপ রেখা সাধারণত বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপকে মানচিত্রে রৈখিক বিন্যাস দ্বারা প্রকাশ করে। সমচাপ রেখা দুটি পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যায়-

১. ঘূর্ণিবাত, নিম্নচাপ বা অবনমন এবং

২. প্রতীপ ঘূর্ণিবায়ু বা উচ্চচাপ।

১. ঘূর্ণিবাত, নিম্নচাপ বা অবনমন (Cyclone, Low Pressure or Depression) : ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। বায়ু উত্তর গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে (Anti-Clockwise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ডানদিকে বেঁকে (Clockwise) যায়। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে বায়ু ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্রেস্থলের দিকে বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয় এবং উষ্ণ বায়ুর সাথে মিলিত হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ঐ এলাকায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

২. প্রতীপ ঘূর্ণিবায়ু বা উচ্চচাপ (Anti-Cyclone or High Pressure) : প্রতীপ ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্রে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। অল্প পরিসর স্থানের বায়ু শীতল হয়ে উচ্চচাপ তৈরি হয়। প্রতীপ ঘূর্ণিবায়ু "ডিম্বাকৃতি" আকারের রৈখিক বিন্যাসের দ্বারা অঙ্কিত হয় এবং তা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে।

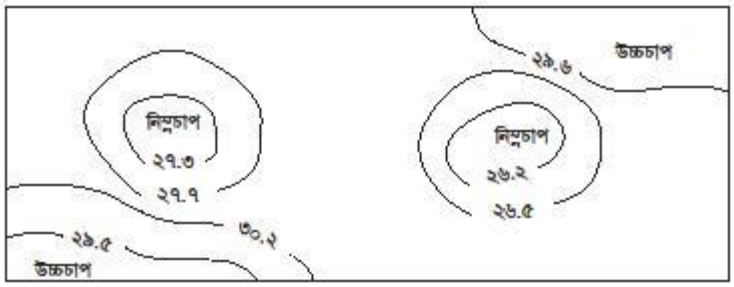

চিত্রঃ ৯.৮.২- সমচাপ রেখার মাধ্যমে বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ নির্ণয়

চিত্রে বায়ুর উচ্চচাপ এলাকাসমূহ একে বেঁকে অঙ্কন করা হলে বায়ুর নিম্নচাপ এলাকাসমূহ ডিম্বাকৃতির আকারে অঙ্কিত হয়েছে। মূলত এই সকল সমচাপ রেখার মাধ্যমেই বায়ুর চাপের তারতম্য অনুধাবন করা যায়।

সমবর্ষণ রেখা (Isohyet Line) : ভূ-পৃষ্ঠের একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট স্থানসমূহকে যখন মানচিত্রে রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয় তখন তাকে বলা হয় সমবর্ষণ রেখা এবং যে মানচিত্রে এ রেখাগুলো দেখানো হয় তাকে সমবর্ষণ রেখা মানচিত্র বলে। সমবর্ষণ রেখা দ্বারা কোনো স্থানের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের উপাত্ত ইঞ্চিতে প্রকাশ করা হয়। আবহাওয়াবিদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা সমবর্ষণ রেখার মাধ্যমে দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাপের সাথে বিভিন্ন বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাপের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারেন।

সমবর্ষণ রেখা অঙ্কন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ : মানচিত্রে সমবর্ষণ রেখা অঙ্কন করার ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের ইঞ্চি পরিমাপকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সাধারণত যে সকল অঞ্চলে একই ধরনের পরিমাপ বিশিষ্ট বৃষ্টিপাতের হার দেখা যায়, ঐ সকল স্থানে সেই ধরনের সমবর্ষণ রেখা অঙ্কন করা হয়।

স্থান	বৃষ্টিপাতের পরিমাপ(ইঞ্চি)	স্থান	বৃষ্টিপাতের পরিমাপ(ইঞ্চি)
ঠাকুরগাঁও	৬০.১	সিলেট	৭১.০
রংপুর	৬০.০	সুনামগঞ্জ	৭০.০
টাঙ্গাইল	৬০.৩	রাজশাহী	৫০.৩
গোপালগঞ্জ	৬১.১	চুয়াডাঙ্গা	৫১.৩
বাগেরহাট	৬০.৩	মাগুরা	৫১.৩

চিত্রে সুনামগঞ্জ ও সিলেট অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ইঞ্চি দ্বারা প্রাপ্ত অনুপাতের হিসেবে যে রেখা অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের হার বেশি। অন্যদিকে রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

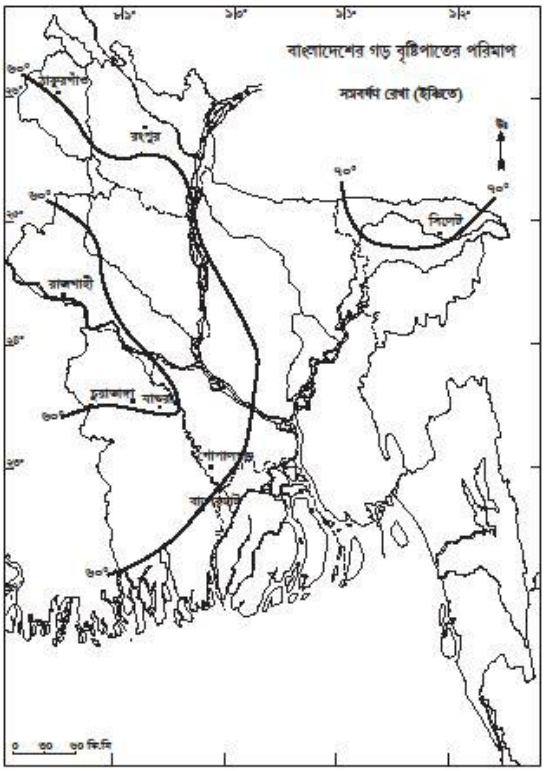

চিত্র-৯.৮.৩-সমবর্ষণ রেখার মাধ্যমে বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাত পরিমাপ

শিক্ষার্থীর কাজ | নিম্নের সারণি থেকে বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের সমবর্ষণ রেখা মানচিত্র অঙ্কন করুন।

স্থান	বৃষ্টিপাতের পরিমাপ
চট্টগ্রাম	৬০.৩
কুমিল্লা	৬১.৪
ব্রাহ্মনবাড়িয়া	৬৫.৭
নোয়াখালি	৬১.০
রাজশাহী	৪৪.০
নবাবগঞ্জ	৪০.১
যশোর	৪২.০০

পাঠ-৯.৯ বৃষ্টিপাত উপাত্তের সাহায্যে রেখাচিত্র অংকন ও বিশ্লেষণ (Analysis of a Line Graph drawn by using Rainfall Data)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৃষ্টিপাতের পরিমাপ ও ঋতুভিত্তিক বিন্যাস সম্পর্কে জানার পদ্ধতি শিখতে পারবেন।

বৃষ্টিপাতের উপাত্ত ব্যবহার করে রেখাচিত্র অঙ্কন ও বিশ্লেষণ

বৃষ্টিপাতের উপাত্ত ব্যবহার করে রেখাচিত্র অঙ্কনের জন্য কোনো একটি মাসের প্রতিদিনের বৃষ্টিপাত বা বছরের প্রতি মাসের গড় বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। এরপর গ্রাফ পেপার বা সাদা কাগজের x কলামে দিন বা মাস এবং y কলামে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখাতে হবে। এভাবে বৃষ্টিপাতের উপাত্তের সাহায্যে রেখাচিত্র অংকন করতে হবে।

নিম্নে শ্রীমঙ্গল উপজেলার ২০১৩ সালের প্রতি মাসের গড় বৃষ্টিপাতের উপাত্ত থেকে একটি রেখাচিত্র অংকন করে দেখানো হলো।

শ্রীমঙ্গল উপজেলার ২০১৩ সালের মাসভিত্তিক গড় বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)

মাস	গড় বৃষ্টিপাত
জানুয়ারি	০
ফেব্রুয়ারি	৯
মার্চ	৩১
এপ্রিল	১০৪
মে	৭৮৩
জুন	৩০১
জুলাই	২৯৩
আগস্ট	৪২০
সেপ্টেম্বর	২৪১
অক্টোবর	১৫৯
নভেম্বর	০
ডিসেম্বর	৫

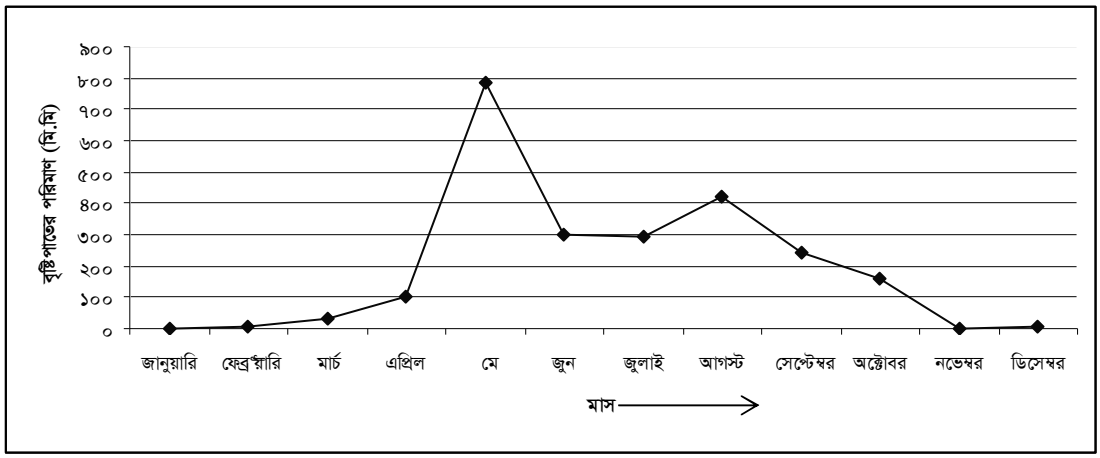

চিত্র ৯.৯.১ : শ্রীমঙ্গল উপজেলার বৃষ্টিপাতের উপাত্ত ব্যবহার করে রেখাচিত্র অংকন

উপরিউক্ত লেখচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, x অক্ষে মাস এবং y অক্ষে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। x অক্ষে উল্লিখিত মে মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (৩৩.৭) এবং জানুয়ারি ও নভেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় (০ মি.মি) জানুয়ারি ও নভেম্বর মাসের উপর অংকিত রেখাটি সবার নিচে এবং মে মাসের উপর অংকিত রেখাটি সবার উপরে দেখা যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্য মাসগুলো অপেক্ষা বেশি থাকায় মান অনুযায়ী রেখাগুলোও উপরের দিকে। অন্যদিকে নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাস এই চার মাস শীতকাল থাকায় মান অনুযায়ী অংকিত রেখাগুলো নিচের দিকে। কারণ শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল থাকায় বর্ষাকালের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম এবং শীতকালের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের উপর অংকিত রেখাগুলো মান অনুযায়ী পাশাপাশি উচ্চতায় রেখাচিত্র দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের সারণি থেকে বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের উপাত্ত থেকে রেখাচিত্র অঙ্কন করুন।

মাস	গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি)
জানুয়ারি	০
ফেব্রুয়ারি	৬৮
মার্চ	৬৯
এপ্রিল	২৯৩
মে	২১৪
জুন	৬২২
জুলাই	২৪৫
আগস্ট	৩৬২
সেপ্টেম্বর	৩৩৩
অক্টোবর	১৫২
নভেম্বর	১৫৯
ডিসেম্বর	১